তৃতীয় অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা

সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বুদ্ধদেবের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অনেক গল্পে। সমাজ-সাহিত্য-জীবন পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ বাস্তব উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় সাহিত্যে। তাই সাহিত্য পাঠ করলে সমসাময়িক সমাজ ও সমকালীন মানুষের সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মানুষ সামাজিক জীব, মানুষের মনের ভাবকে সমাজ অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে। সেই প্রভাব শুভ হতে পারে, অথবা অশুভ। কোথাও তা প্রত্যক্ষ আবার কোথাও প্রতিফলিত হয় পরোক্ষভাবে। আর মানুষের মন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে সমাজকে কেন্দ্র করেই। সমাজের বাধানিষেধ, ধর্মীয় অনুশাসন, নীতি-নিয়ম সব কিছুই মানুষের উপর ক্রিয়াশীল। সাহিত্যে জীবনের স্পর্শ পাওয়া যায়, তাইতো সাহিত্যকে জীবন ও সমাজের দর্পণ বলা হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব বসু যাদের দেখেছেন, অভিজ্ঞতায় পেয়েছেন তাদের কথাই গল্পে বলেছেন। তাঁর গল্পে দেখা যায় বিচিত্র মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখের কথা তিনি বলেছেন। আমাদের সমাজের বাস্তব উদাহরণ তাঁর গল্পে খুঁজে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর বিভিন্ন গল্পে সমাজ বাস্তবতার নানা খুঁটিনাটি দিক নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন— 'খাতার শেষ পাতা', 'লজ্জা', 'চোর! চোর!' প্রভৃতি। এক উত্তীর্ণ সম্ভাবনার আশ্বাস বুদ্ধদেব বসুর গল্পের বড় ধরন। কখনো সাধারণ ইশারা কখনো প্রায় প্রতিবাদী ভঙিতেই সবরকম অসঙগতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তিনি।

১৯৪৩ সালে 'খাতার শেষ পাতা' সংকলনের একটি গল্প 'রিকশাওয়ালা'

এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ। স্বামী, স্ত্রী, দুই সন্তান নিয়ে একটি দরাজ পরিবার রিকশা চড়ার পরে রিকশাওলাকে যে পারিশ্রমিক দিতে চায়, রিকশাওলা তা নিতে অস্বীকার করে। ফলে তাকে ভাড়া না মিটিয়েই দুর্ব্যবহার করে চলে যায় তারা। রিকশাওলাটি কিন্তু অপেক্ষা করে তাদের, তাদেরই ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং তারা ফেরার পরে, নির্মম সচেতনতায় তাদের পথের ধূলোয় ফেলে দেয়। তারপর সমবেত মানুষজনের আক্রমণ নীরবে সহ্য করে সে।

"... রিকশাওলা আবার উঠে তার রিকশার ডাণ্ডা ধরে দাঁড়িয়েছে। তার রক্তমাখা মুখে অদ্ভুত হাসি আঁকা... শরীরে তার অসহ্য ব্যাথা, কিন্তু মনে কেন তার ফুর্তি সেও জানে না।"[১] এই নিরপরাধ ফুর্তির উচ্চারণেই ধরা পড়েছে অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব বসুর প্রতিবাদী চরিত্র।

সমাজ বাস্তবতার নানা দিক আমরা বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন সময়ে পেয়েছি। যেমন তাঁর 'চোর! চোর!'— গল্পটিতে আছে এক পতিতার ঘরে মাঝরাতে চড়াও হওয়া এক সমাজ বিরোধীর গল্প। যে পতিতা এখনও মনের দিক থেকে পুরোমতে পতিতা হয়ে উঠতে পারেনি, এবং যে চোর এখনও পুরোমতে চোর হয়ে উঠতে পারেনি। তাদের মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প এটি। গল্পের শেষে চোরটি পতিতার বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, আর তার শুশ্রুষা করতে গিয়ে নাগরিকা পতিতার মনে পড়ে ফেলে আসা গ্রাম বা মাঘ মণ্ডলের গান। আলোচ্য গল্পটিতে বুদ্ধদেব বসু একটি চোর ও একজন পতিতা নারীর মধ্যে সম্পর্কের মাধুর্য দেখিয়েছেন। সমাজে এরা দু'জনেই অতি তুচ্ছ। লোকে এদেরকে হেয় চোখে দেখে। একটি চোর যার নাম কমল সে অভারের তাগিদে চুরি করতে বাধ্য হয়েছে আর ললিতা যে পতিতা বৃত্তিতে রত সেও অভাবের তাড়নায় এই বৃত্তি

গ্রহণ করেছে। এই জন্যই ললিতার মনে কমলের প্রতি ঘৃণা না জন্মে স্নেহ জন্মেছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর বিভিন্ন গল্পে এরকমই সমাজ বাস্তবতার ছোটখাটো দিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

'বেহালা-বিপিন' গল্পটিতে বিপিনের নিস্তরঙ্গ, নিরুদবিগ্ন, সুখী জীবনের বর্ণনা উল্লিখিত; কিন্তু সেই বর্ণনার আড়ালে রিনরিনে দুঃখ খেলা করে। গল্পটি শেষ হয়ে যাবার অনেক পরে আমরা বুঝতে পারি এই দুঃখের উৎস কী— এক নিপাট ভালো মানুষের আনন্দময়তা কেজো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হবার বেদনা, এক সরল ও নির্বিবাদী মানুষ আর পাঁচজনের মতো না হবার বিড়ম্বনা, সংসারের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট বাস্তব ও সফল না হবার সমস্যা, সব মিলেমিশে এক ব্যাখ্যাতীত দুঃখের আবহ সৃষ্টি করে, যা আমাদের সমাজের একটি বাস্তব উদাহরণ, আমাদের সমাজে বিপিন একা নয় তার সহযোগী বন্ধু আরো অনেক আছে।

বুদ্ধদেবের 'সার্থকতা' গল্পে অভাবগ্রস্ত সিতাংশু বারবণিতা অমলাকে ভালোবেসে পাপপঙ্কিল জীবন থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে দূরে ঘর বাধার আশায় মালিক নবীনবাবুর টাকা চুরি করে, এর পেছনে একধরনের হঠকারিতা ক্রিয়াশীল; সেখানে সিতাংশু চরিত্রটি অমলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও রূঢ় বাস্তবতার নিষ্পেষণ থেকে পরিত্রাণ করতে চায়; যদিও তার সংকট অপরিণামদর্শিতা-আক্রান্ত বলে এবং মূল কাহিনীভাগ অনাবশ্যক দীর্ঘায়িত ও অতিনাটকীয়তা-আচ্ছন্ন হবার ফলে সিতাংশু প্রেম ও ত্যাগ স্বীকারের সার্থকতা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় না। হৃদয়ের জাগরণ-এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'আদর্শ'। এই গল্পের কাহিনীভাগে আছে চলচ্চিত্র নায়িকা ও তার ব্যর্থ লেখক স্বামী অনিমেষের প্রেমহীন, বিমুক্ত জীবনের

খণ্ডচিত্র। দুই নারী-পুরুষের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব গল্পটির সিংহভাগ জুড়ে থাকলেও গল্পের শেষে অনিমেষের অর্ধ-সমাপ্ত উপন্যাসের একটি বিচ্ছিন্ন অংশের সন্ধান পাওয়া যায়, যা শুধু গোটা গল্পটিরই আত্মা নয়, গল্পকার বুদ্ধদেবের হয়তো সামগ্রিকভাবে শিল্পী বুদ্ধদেবেরই জীবনালেখ্য বলা যেতে পারে। এই অংশটুকুর মধ্যে সমাজের করুণ বাস্তবতার নানা দিক ফুটে উঠেছে— ''এই পৃথিবীতে, যেখানে বিচারপতি কয়েদিকে হত্যা করে, রাষ্ট্রনেতা যৌবনকে বিনষ্ট করে, পুরোহিত ধ্বংস করে ভগবানকে, আর বুদ্ধিবৃত্তিকে বধ করে শিক্ষক সম্প্রদায়, যেখানে গতানুগতির নাম নিষ্ঠা, নিঃসাড়তার নাম সংযম, আর একটি বই স্ত্রী অথবা পুরুষের সঙ্গে পরিচয় না থাকাকেই বলে চরিত্র, এই পৃথিবীতে যেখানে রাজত্ব করে গুণ্ডা, বোকা অথবা ধূর্তেরা, পুরস্কৃত হয় মিনিমুখো ভালোমানুষের দল— মিনিমুখো, মিনিমুখো, মিনিমুখো— যারা নিরাপদে কারো সর্বনাশ করতে পারলে সর্বনাশ করে, তাতে নিজের কোনো লাভ না থাকলেও, আর সেই মানুষই শক্তিতে আরো বড় হলে তাঁর পদধূলি ভক্ষণ করে, তাতে নিজের কোনো লাভ না থাকলেও যেখানে কোনো না কোনো মিথ্যাচরণ না করে বেঁচে থাকা যায় না, দেহ ছাড়া জীবন নেই এবং দেহ থাকলে মুক্তি নেই যেখানে; যেখানে কিছু করতে গেলেই লিপ্ত হতে হয় পাপে, কিছু ভাবতে গেলেই ক্ষুব্ধ হতে হয় সংশয়ে, যেখানে কোনো বাসনা নেই যা বিতৃষ্ণা আনে না; কোন বিপ্লব নেই যা আর এক বিপ্লব দাবি করে না; কোনো হীন অথবা মহৎ বৃত্তি নেই যা নিজের বিপরীতের জন্য ব্যাকুল নয়; যেখানে মানুষকে বিবেকহীন বলে না ভাবলে আইন প্রণয়ন করা যায় না, নির্বোধ বলে না ভাবলে গঠন করা যায় না শাসনতন্ত্র, পাষণ্ড বলে না ভাবলে আবিষ্কার করা যায় না সমাজ :— সভায় সংঘে বক্তৃতায়, অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে ভারাক্রান্ত এই পৃথিবীর

বিরামহীন বিলাপের মধ্যে সে চেয়েছিলো রচনা করতে একটি সাধু জীবন, ব্যক্তিগত, নির্মল, নির্লিপ্ত, একটি পবিত্র জীবন...।"[২] বুদ্ধদেবের গল্পের আবেদনের সঙ্গে অনিমেষের অসমাপ্ত উপন্যাসের খণ্ডিত অনুচ্ছেদ গুলির সুরধ্বনি অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ। অনিমেষ যখন খাতা বন্ধ করে নিজের লেখাটি সম্পর্কে ভাবে, সেই ভাবনার মধ্যেও আমরা খুঁজে পাই বুদ্ধদেবের সাহিত্যভাবনা ও শিল্পাদর্শের ঠিকানা।

একটা গল্প থেকে আরেকটা গল্প সেটা থেকে আরেকটা গল্প জন্ম নেয়। 'বিষবৃক্ষ' থেকে 'চোখের বালি' 'চোখের বালি' থেকে 'গৃহদাহ'। একজন সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের ভোক্তা লেখক কখনও কোনো গল্প, কোনো প্লট বা আইডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হবেন না— এমন হয় না। বুদ্ধদেব বসুর 'চার দৃশ্য' এইরকম একটি গল্প। আন্তন চেখভের 'এনিমিজ' গল্পটিকে নিয়ে শুরু করে সম্পূর্ণ অন্য আবহে পৌছোন তিনি। দুটি গল্পেই জনৈক ডাক্তারের একমাত্র ছেলে মারা গেছে। বাড়িতে তিনি একাই জেগে পায়চারি করছেন, জীবন নিরর্থক মনে হচ্ছে। এমন সময় কড়া নড়ল। চেখভের গল্পে লোকটি অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের, তার স্ত্রী নিদারুণ যন্ত্রণায় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে, সে অনেক কাকুতিমিনতি করে ডাক্তারকে রাজি করিয়ে তাঁকে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরল, দেখা গেল বাড়ি খালি, স্ত্রী অসুস্থতার ভান করে স্বামীকে সরিয়ে দিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে। তারপর ডাক্তার ও ওই লোকটি, অ্যাবোজিন, মুখোমুখি। অ্যাবোজিন তার অমর প্রেম, স্ত্রীকে সে কত দিয়েছে, কেন সে বিশ্বাসঘাতকতা করল এই নিয়ে যতই তার যন্ত্রণার কথা বলে যাচ্ছে ডাক্তার ততই ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মনে হচ্ছে এই লোকগুলি চূড়ান্ত অলস, অশ্লীল, ফাঁপা ফানুসের মতো, অলীক অর্থহীন এদের জীবন। তাঁর মতো কাজের মানুষকে

তার দুরন্ত শোকের সময়ে এভাবে ডেকে এনে লোকটি তাঁকে, তাঁর শোককে অপমান করেছে। এই গল্পের মধ্যে রুশ সমাজের বিভাজনগুলো নিয়ে কিছু মনস্তাত্ত্বিক খেলা আছে। বিত্তবান জমিদার শ্রেণী সেখানে গানবাজনা, পার্টি, প্রেম, পরকীয়া ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকে ডাক্তার শ্রেণী তখনও যাকে বলে ওয়ার্কিং ক্লাস, তাদের মর্যাদা এই বিত্তবান লোকগুলির সমান নয়।

আমাদের সমাজে ডাক্তাররা চিরকালই তুঙ্গে। তারা বিত্তবান শ্রেণীতেই পড়েন। বুদ্ধদেব তাঁর ডাক্তারকে মেকি সমাজের মূল্যবোধের সামনে দাঁড় করাননি, মুখোমুখি করিয়েছেন বাস্তব ও মানবিক সম্পর্কের সামনে। অ্যাবোজিনের জায়গায় এখানে শম্ভু ঘোষ, একটি নিম্নবিত্ত বাবা, যার ছোট্ট মেয়ে বাবলির ধনুষ্টংকার হয়েছে। সে দীনভাবে বিখ্যাত ডাক্তার প্রশান্ত বাগচির কাছে অনুনয় করে। ডাক্তারের ছোট্ট ছেলে বিনু মারা গেছে। শূন্যে বাড়িতে ডাক্তার পাথরের মতো বসে আছেন। কেন কে জানে হঠাৎ শম্ভু ঘোষের অনুনয়ে তিনি রাজি হলেন, নিজেই গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে গেলেন টালিগঞ্জের বস্তিতে। সারারাত যুদ্ধ করে বাবলিকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন। মেয়েটি 'বাবা' ডাকাতে প্রথমটা তার কেমন বিভ্রম হল। 'বিনু' বলে তিনি তার মাথায় হাত রাখলেন। এই গল্পটিতে ভারতীয় বাস্তবতা, ভারতীয় সমাজ মানবিকতা যা এই মুহূর্তে দুর্লক্ষ্য এই সমস্ত মূর্ত হয়ে উঠেছে ওইটুকু পরিসরে।

এ রকমই আরেকটি গল্প হচ্ছে 'প্রশ্ন'। গল্পটিতের দুটি ভিন্ন কাহিনী বর্ণিত। একটিতে আছে একটি দরিদ্র শিশু একমাত্র আর্থিক দায়বদ্ধতার জন্য তার মা-বাবার সামনে মারা যায়, তার অপর কাহিনীতে আছে এক ধনী চিকিৎসকের পিতা ৮১ বছর বয়সেও উদ্ভিদের মতো বেঁচে আছেন, মৃত্যু প্রতিবার তার কাছ থেকে এসে

চলে যায়। প্রথম কাহিনীতে দেখি দরিদ্র পিতা তার ছেলের জন্য আক্ষেপের সাথে নিজের অবস্থার বিপরীতে প্রায় প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে ওঠেন— ''কেন তাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাওয়া হবে না, কেন তাকে বড়ো হয়ে উঠতে দেয়া হবে না, কেন একজন কবি হবার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে? কেন? কেন?''[৩]

গল্পটির দ্বিতীয় পর্বে দেখি ধনী চিকিৎসক সুশীল সরকার শুধু টাকা উপার্জন করেই যাচ্ছে তার পৈতৃক সম্পত্তিও প্রচুর। তাদের তিনতলা বাড়ি, সেই বাড়ির দক্ষিণের ঘরটা পাহাড়ের মতো উঁচু ও মাঠের মতো বিস্তৃত একটি খাটে অগুনতি বালিশে শরীরটাকে অশ্রিত করে এককালীন প্রতাপশালী জমিদার, এককালীন বঙ্গবিখ্যাত মদ্যপ জগদ্বন্ধু সরকার আজকাল শায়িত থাকেন। ৮১ বছর বয়সেও মৃত্যু তার কাছে এসে ফিরে যায়। সুশীল সরকারের ছোটবেলা থেকেই পিতৃভীতি প্রবল ছিল। সেই ভয়ংকর রক্ত-হিম করা কণ্ঠস্বর, সেই সব মার ভাবতে এখন পর্যন্ত সুশীলের হাত-পা দুর্বল হয়ে আসে। মার খেতে খেতে নাক দিয়ে রক্ত পর্যন্ত বেরিয়ে যেত তার। তাই ছোটবেলা থেকেই বাবার প্রতি তার মনে তীব্র হিংসা জন্মেছিল। এখনো সেই ঘৃণা প্রচ্ছন্নভাবে আছে তার মনে।

জগদ্বন্ধু সরকার প্রবল প্রতাপী মানুষ, তার বয়স অনুসারে তিনি ভালোই আছেন। কিন্তু তার মতে একে কি ভালো থাকা বলে, বেচে থাকা বলে; এতো শুধু মরা মানুষের তুলনায় ভালো তিনি জীবিতদের মধ্যে বাচতে চান, মৃতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তিনি চান না। তার মতে— 'বয়স হয়েছে বলেই সারক্ষণ খাটের উপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে হবে নাকি?'[৪] আর তারই পুত্র সুশীল সরকার ও তার স্ত্রী প্রতিক্ষণ তার মৃত্যুর প্রত্যাশা করছে। তাদের মতে বাবার অনেক বয়স হয়ে

গেছে সুতরাং তার এখন যাবার সময় এসে গেছে, এটাই হচ্ছে আমাদের সমাজের বাস্তব উদাহরণ। সুশীল ও তার স্ত্রী কোন অবস্থায় এখন আর মদ্যপ বাবাকে সহ্য করতে পারছে না। সুশীলের স্ত্রী একদিন বলে ওঠে— ''একটু বেশি করে ব্র্যান্ডি প্রেসক্রাইব করো— তাহলেই বুড়ো আর জ্বালাবে না।''[৫] সুশীল ও মনে মনে ভাবে যে— ''সত্যি কি বুড়ো কোনোদিন মরবে না? কতকাল আর বেঁচে থাকবে? কী আসুরিক শরীর।''[৬] জগদ্বন্ধু নিজের মুখ দিয়ে 'এবার আমি নিশ্চয়ই মরছি' শব্দটি অনেকবার উচ্চারণ করেছেন কিন্তু সুশীলের কানে কবে এই সুখবর আসবে তা সে প্রতিনিয়ত ভাবে। তার মতে গেলো দু'বছর ধরে ক্রমন্বয়ে তিনি মরছেন। তেতলায় তার কার্পেট বিছানো ঘরে বৃহদায়তন খাটে শুয়ে তিনি মরছেন, এই সংবাদ দু'বছর ধরে তার ছেলেমেয়ে, পুত্রবধূ-জামাতা, নাতি-নাতনীরা, আশ্রিত, ভৃত্য-সবারই জানা হয়ে গেছে। কর্তাবাবু মরবেন— এ কথা শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে তাদের, যে কোনোদিন, যে কোনো সময় তার মৃত্যুসংবাদ শোনার জন্য তারা প্রস্তুত।

জগদ্বন্ধু সরকারের অসুখ আর কিছুই নয়; অসুখ তার নিজের জীবন, তার একাশি বছরের দীর্ঘ জীবন। তার জীবনই তাকে ক্ষয় করতে চলেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই ক্রিয়াকে তিনি বদলে দিতে চান— ঘড়ির কাটা অনুসারে দিনযাপনে, পরিমিত আহারে, খাদের সঙ্গে প্রায় সম-পরিমানে ঔষুধ সেবনে, ডাক্তারকে নিত্য সঙ্গী করে। জীবনের শেষ পর্বে এসেও তিনি রোজ দুটি পেগ মদ্য সেবন করেন। কেননা তাকে বাচতে হবে। তিনি কিছুতেই মরতে চান না, তিনি আরো দশটি বছর বাচতে চান, তাঁর মতেআশি বছর যে বেঁচেছে সে নব্বই বছর ও বাচতে পারে। তিনি রোজ ছেলেকে বেঁচে থাকার নতুন নতুন উপায় জিজ্ঞেস করেন। উপায় না পেয়ে সুশীল

সরকার একদিন বলল কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়ে থাকলে হয়তো তাঁর রোগ কিছুটা সারবে। জগদ্বন্ধু হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন— ''তোদের ডাক্তারদের মুখে ঐ তো এক কথা! আর কিছুতেই যখন কুলোয় না তখন চেঞ্জ! এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলেই যদি রোগ সারবে, তাহলে এতগুলো ডাক্তার ছাগল খেয়ে আছে কী করে? যে সব গোরু ঠকিয়ে তোর মতো গোরুও পয়সা করেছে, ও সব ছেঁদো কথা তাদের কাছে বলিস।''[৭]

একদিন রাত্রে হঠাৎ কর্তাবাবুর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলো, সুশীল থেকে আরম্ভ করে বাড়ির ঝি পর্যন্ত জেনে গেলো যে এতদিনে সেই প্রত্যাশিত মুহূর্ত এসেছে। শহরের সব বড়ো ডাক্তারদের ডাকা হলো, উৎকণ্ঠায় ও প্রতীক্ষায় সারা রাত কাটলো, ভোরে কর্তাবাবু আবার ঠিক হয়ে উঠলেন আরো কয়েক লক্ষ বারের মেয়াদ নিয়ে জগদ্বন্ধুর স্বাভাবিক স্পন্দন আরম্ভ হলো আবার। অনিদ্রাক্লান্ত স্বরে রেখে একেবারে লাল হয়ে সুশীল তার স্ত্রীকে বলে উঠল— ''কী শক্ত হাড় বুড়োর। মরতে মরতে বেচে উঠল।''[৮]

বুদ্ধদেব বসু আলোচ্য গল্পটিতে সামাজিক বাস্তবতার দুটো ভিন্ন দিক উদঘাটন করেছেন, —একটি কাহিনীতে মৃত্যুর প্রত্যাশা করছেন সবাই কিন্তু মৃত্যু আসছে না, এমনকি যিনি মরবেন তিনি অনিচ্ছায় হলেও প্রতিনিয়ত ভাবছেন এই তো মৃত্যু আসবে, যে ছেলেকে তিনি পড়াশোনা করে মানুষ করেছেন সেও বাবার মৃত্যুর অপেক্ষা করছে রোজ; আর অপর কাহিনীতে একটি শিশু যে জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না সম্পূর্ণ রূপে অজানা, তার চোখে কত কী স্বপ্ন বড় হয়ে সে অনেককিছু করতে চায়, অনেক বড়লোক হতে চায় কিন্তু বিধাতার কী যে ইচ্ছা এই ছোট্ট শিশুটির চোখের আলো নিভে যায়। একমাত্র আর্থিক

অনটনের জন্য সে তার মা-বাবার চোখের সামনেই মারা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর 'দুইমা' গল্পটির মধ্যে সমাজের এক করুণ বাস্তবতা আমাদের চোখের সামনে হাজির হয়। গল্পটিতে আমরা দেখি ছোট্ট বাণ্টি ও তার পিসতোতো বোন শোভা ডিপথেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। শোভার মা মলিনার এতটুকু অবস্থা ছিল না যে সে তার মেয়েকে ঘরে রেখে চিকিৎসা করাবে, কারণ সে অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে এবং সে তার দাদার কাছে আশৃত। মলিনার দাদার এতটুকু সামর্থ ছিল না যে তিনি ছেলে বাণ্টি ও ভাগিনী শোভার একসাথে ঘরে চিকিৎসা করাবেন। কারণ এক একটা ইনজেকশনের দাম এক হাজার টাকা। তখনকার সময় সবার ধারণা ছিল যে হাসপাতালে গেলে কেউ ফিরে না। তা জানা সত্ত্বেও মহিমবাবু উপায় না পেয়ে শোভাকে হাসপাতালে ভর্তি করালেন এবং স্ত্রীর স্বার্থপরতার ফলে বাণ্টির চিকিৎসা ঘরে শুরু করালেন। মলিনা যেন মনে মনে মেনেই নিল শোভা আর নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই সে জেনেছে যে তার বেঁচে থাকাটাই অপরাধ। শ্বশুরবাড়িতে অপরাধী সে, দাদার কাছে অপরাধী বৌদির কাছে দ্বিগুণ, এ বাড়ির ছেলে মেয়ের কাছে, বাড়ির ঝির কাছে, চুরি করে খেতে আসা পাড়ার বেড়ালটার কাছেও সে অপরাধী— তার জন্য বেড়ালেরও ভাগে কম পড়েছে। এসব জেনে শুনেই তাকে বাচতে হবে, এসব মেনে নিয়েই সে বেঁচে আছে— ছিলো তো এতদিন— কিন্তু আবার তার উপর এই নতুন অপরাধ বাণ্টির মায়ের— ''বাণ্টির কেন ছোঁয়াচ লাগলো? বাণ্টির কেন অসুখ করলো? আর যা হতো, আর যা হবার সব তো হলো কিন্তু এটা কেন, এটা কেন—''[৯]

মলিনা উঠে পড়ে লাগলো— তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে। মনে

মনে বললো ‘‘ভগবান, ভগবান, বাণ্টিকে বাঁচাও।’’[১০] না খাওয়া, না ঘুমোনো, অক্লান্ত অধৈর্যহীন পরিশ্রমের আচ্ছন্নতায় সে যেন ভুলে গেলো কোনজন তার সন্তান আর কোনজন নয়। তার এই ভগবানের কাছে চাওয়ার ফলেই হয়তো বাণ্টি মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে আসল। আবার শোভার কথা মনে করে মলিনা বলে উঠল— ‘‘শোভা আমার, সোনামনি, আমার প্রাণ— সেরে ওঠো, ফিরে এসো। চোখের আলো আমার, বুকের রক্ত আমার, বেঁচে থাকার অর্থ আমার, ফিরে এসো। ভগবান বাঁচাও। ওকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।’’[১১] কিন্তু সে তার চোখের নীলমনিকে বাঁচাতে পারলো না। হ্যাঁ শোভা আর নেই! চিকিৎসার অভাবে সে মারা গেলো। সেই যে কোঁকড়া চুলের ছোট্ট শোভা সারাদিন ধরে হাসতো আর খেলতো তার কথা এখন কেউ বলে না, তার নাম কেউ বলে না, তাকে যেন কারোরই মনে নেই। যেন সে কোনকালেই ছিল না, এই রকম ভাবটা সকলের।

অন্যদিকে দেখি শোভার মা নিজের মনকে শক্ত করে বাণ্টির মধ্যে শোভাকে খুঁজতে শুরু করে, তাকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। বাণ্টিও এখন পিসি ছাড়া আর কিছু বোঝে না, পিসির কাছে স্নান করবে, পিসির কাছে খাবে, পিসির কাছে শোবে। যার ফলস্বরূপ মলিনাকে শুনতে হয় বৌদির তীব্র কটাক্ষ— ‘‘রাক্ষসী! নিজের পেটেরটাকে খেয়েছিস, এখন আমারটাকেও খেতে চাস! নাকি ভেবেছিস মেয়েকে খেয়ে ছেলে পাবি।’’[১২]

গল্পটির মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে আর্থিক দৈন্যতার ফলে মানুষকে সবার কাছ থেকে নানান কথা শুনতে হয় তাকে বিনা প্রশ্নে সবকিছু মেনে নিতে হয়। তাইতো শোভার মা তার অভাবের ফলে তার মেয়েকে

বাঁচাতে পারেনি অপরদিকে তারই ভাইপো বাণ্টি ভালো চিকিৎসার ফলে তারাতারি একই রোগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সেড়ে উঠল। আমাদের সমাজে যে নারী বিধবা তাকে সবাই হেয় চোখে দেখে তার স্বামী চলে যাবার সাথে সাথেই সে যেন সবার কাছ থেকে ভালো কিছুর প্রত্যাশাটুকুই হারিয়ে ফেলে। সে যতই ভালো কাজ করুক না কেন সেই কাজকে কখনো ভালোচোখে দেখা হয় না। তাইতো মলিনা নিজের কন্যাকে হারানোর ব্যাথা ভুলে বাণ্টির সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেও তাকে বৌদির কাছ থেকে অনেক কিছু শুনতে হয়েছে। মলিনা বিনাস্বার্থে শুধু করে যাচ্ছিলো আর পরিণামে তার বৌদির তীব্র কটাক্ষ শুনে যাচ্ছিল। এটাই হচ্ছে আমাদের সমাজের করুণ বাস্তবতা।

বুদ্ধদেব বসু বিভিন্ন সময়ে তাঁর গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের এক একটি পয়সার জন্য সংগ্রাম, নিজের মনে ইচ্ছাকে ভুলিয়ে শুধু বেঁচে থাকার লড়াই ইত্যাদি বাস্তব উদাহরণ উদঘাটিত করেছেন। এমনই একটি গল্প 'মা-বোন-ভাই'। এই গল্পের নায়ক বারীণ পড়াশোনায় ভালো। সে পাঠ্যসূচির ভেতরে বাইরে পড়াশোনা করেছে, চেয়েছে বোনকেও পড়াতে। বিএ-তে ইংরেজি অনার্সে বারীণ ফাস্ট হয়ে বেরোলো, তার ইচ্ছে ছিল এখন এম এ-তে ভর্তি হবে কিন্তু ভাগ্যের দরুণ যেদিন তার পরীক্ষার ফল বেরোলো তার ঠিক দশ দিনের দিন তার বাবা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন। এতদিন বাবা থাকা অবস্থায় সংসারের সব দায়িত্ব বাবার উপর ছিল কিন্তু এখন সমস্ত উৎসাহ নিভিয়ে প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশে তাকে নামতে হল জীবন সমুদ্রে। বাবা একটি পাঁচ হাজার টাকার ইনশিওরেন্স পলিসি ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। এই টাকাটাও রেখে দেওয়া হল তার বোন অরুন্ধতির বিয়ের জন্য। বারীণকে শূন্য থেকে শুরু করতে হলো।

এক একটি পয়সার জন্য তাকে দিনরাত খাটতে হতো। কুড়ি বছরের ছেলে বারীণ সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। ''সত্যিই সমুদ্র। কী প্রকাণ্ড ঢেউ, আর কী সব রাক্ষুসে হাঙর ভালো মানুষ সেজে চরে বেড়াচ্ছে। এক একবার তলিয়ে যায়, আবার মাথা তোলে, এক একবার হাঙরের হাঁ তাকে গিলতে আসে কেমন করে বেঁচে যায় সে-ই বোঝে না।''[১৩] সে যতই রোজগার করে, অভাব যেন আরও দ্বিগুণ বেগে বেড়ে চলে। কাপড়চোপড়, অসুখবিসুখ, জুতো, গরম জামা, বিছানা, বালিশ, বাসন, সব্জি, মাছ-মাংস-সংসারে কত কিছুই আছে। বাবার শান্ত বিষণ্ণ মুখ ভেসে ওঠে বারীণের চোখের সামনে, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে তার— ''বাবা বলে দাও তুমি কী করতে, কেমন করে চালাতে।''[১৪] এত টানাটানি থাকা সত্ত্বেও সে পরিবারের কারুর কোন কষ্ট হতে দেয়নি, সে অরুকে কলেজে ভর্তি করিয়ে বিএ পাশ করিয়েছে। ইচ্ছে ছিল নিজে এমএ পড়তে পারেনি তাই অরুকে এমএ পড়াবে। কিন্তু তা মা কিছুতেই রাজি হলেন না— ''হয়েছে, মেয়েকে আর অতবেশি মানুষ হতে হবে না— তুমি যা মানুষ হয়ছো তাতেই আমার চলে যাবে।''[১৫] বারীণ ঠিক করলো অরুর বিয়ে খুব ভালো করে দেবে। একসঙ্গে বড়ো হয়ে উঠেছে দু-জনে, খেলা দুষ্টুমি, পড়াশুনো, সব একসঙ্গে— কত তার সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা। যেখানে যে সুন্দর জিনিস চোখে পড়ে সবই মনে হয় অরুকে মানাবে— ''কেন তার হাতে দশ হাজার টাকা নেই, লক্ষ টাকা নেই, কেন একদিনের জন্য আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ তার হাতে এলো না?''[১৬] যাক যা-তা করে খুব ভালো করে বোনের বিয়ে দিল। যে বোনের জন্য সে এত করল সেই বোনই শেষপর্যন্ত তাকে কথা শোনাতে ছাড়েনি, অরুন্ধতির বাক্যবন্ধে বারীণ একেবারে ভেঙে পড়ল। এটি মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বাস্তব উদাহরণ,

নিজের স্বপ্ন হারিয়ে সে নিঃস্বার্থ সবার জন্য করে যায় তার এই ত্যাগ বোঝার দায় কারোর নেই।

বুদ্ধদেবের পরিবার প্রধান গল্প সমূহে যে দারিদ্র্য ঋণ ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির উদাহরণ রয়েছে, তা আমাদের অনুভূতির গড়নের মধ্যে ধরা দেওয়ার জন্যই আসলে এসব গল্পের যাত্রা। বুদ্ধদেবের গল্পের শিল্পী সাহিত্যিকেরা তো বটেই, এমনকি তার গল্পের কেন্দ্রের সাধারণ চরিত্রেরাও বিশেষভাবে অনুভূতিপ্রবণ, ভাবপ্রবণ ও কোথাও কোথাও তারা হয়তো স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল যে সমাজে তাদের বিচরণ, সেখানে তারা অসেচতনভাবেই একটা ভাবাদর্শ গড়ে তোলে, বিশেষ কোনও মতাদর্শে নিশ্চিত ও দীক্ষিত না হলেও তাদের জীবনেও এবং রচনায় আদর্শের একটি স্তর তৈরী হয়ে গেছে।

আমাদের সমাজের এক চিরকালীন বাস্তবতা উদঘাটিত করেছেন বুদ্ধদেব বসু তার 'প্রথমা' গল্পটিতে। এই গল্পে পিতামহ অর্থাৎ ভুপেশবাবু তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের মেয়েকে প্রথম দেখেন, তেরো বছরের মেয়েটিকে তাঁর কেবলই ষোলো বছরের মনে হয়, ফ্রক পরা মেয়েটিকে তিনি শাড়ি পড়তে বলেন, পান খেতে বলেন, তার বাবা মাকে তার বিয়ে দিতে বলেন বারবার, তাঁর তন্দ্রায় স্বপ্নে সে মেয়েটি সিঁদুর পরা ষোড়শী হয়ে আসে। নাতনির মধ্যে তিনি এভাবে প্রত্যক্ষ করেন তার প্রথমা স্ত্রীকে, ষোলো বছর বয়সে প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছিল। ফুটফুটে তেরো বছরের লিলিকে ভুপেশবাবুর বারবার তার মাতা-পিতাকে বিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করতে লাগলেন এমনকি যাবার সময় টাঙ্গা থেকে নেমে পুত্রবধূর কানে কানে বলে উঠলেন— ''বেশি দেরি করো না— বুঝেছো? ষোলো বছর হলো— এটাই ঠিক বয়স, এটাই ঠিক বয়স।''[১৭] এরকমই

আরেকটি গল্প ‘রাধারানীর নিজের বাড়ি’। এই গল্পের রাধারানী মাত্র তেরো বছর বয়সে সংসার জীবনে প্রবেশ করে। যখন লেখাপড়া করার সময় তখনই তার উপর সাংসারিক দায়িত্ব এসে পরল। সে স্থানীয় মেয়েদের স্কুলে কয়েকদিন যাতায়াত করেছিলো, কিন্তু লেখাপড়ায় মন ছিল না তার। বইপত্র ব্যাপারটা তার পছন্দ ছিল না। কারণ ছেলেবেলা থেকেই সে জানতো সে একটু বড়ো হয়ে উঠতে না উঠতে মা-বাবা তার বিয়ে দিয়ে দেবেন। তাই তার সব চিন্তা গিয়ে পড়েছিলো বিয়ের উপর— ‘‘বিয়ে! বিয়ের কথা ভাবতে তার কোনোরকম আনন্দ হতো না, কষ্টও হতো না, সে শুধু তা মেনে নিয়েছিলো মনে মনে— মেনে নিয়ে চুপ করেছিলো। আর তবু তার মধ্যে ছিলো অনেকখানি শক্তি উৎসাহ, যা চালনা করতে পারলে সে খুশি হয়।’’[১৮] রাধারানী সংসার জীবনে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে রেখেছিল। তার পর পর তিনটি সন্তানের মৃত্যু হয়। রাধারানী প্রায় মেনে নিয়েছিল যে মা হওয়ার সুখ সে কখনও ভুগ করতে পারবে না। এমন অবস্থায় সে আবার একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল যার নাম খোকা। রাধারানী নিজে থেকে একরকম প্রস্তুতই ছিল যে যখন তখন খোকার মৃত্যু সংবাদ তার কানে এসে পৌঁছবে। এক বছর কাটলো। এর আগে তার কোনো সন্তান এক বছর বয়সে পৌঁছতে পারেনি। খোকার জন্য বিশাল উত্তপ্ত ভালোবাসায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। তার এতদিনকার নিপীড়িত ব্যর্থ মাতৃত্ব হঠাৎ জেগে উঠলো। একজনকে অন্তত বিধাতা রেখেছেন তার আনন্দের জন্য তাকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য। রাধারানীর স্বপ্নের বাড়ি তৈরী হয়, গৃহ প্রবেশের অনুষ্ঠান হয়, পরের দিন খোঁকা সিড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে মারা যায়। শুনে রাধারানী বলল— ‘জানতুম’। বুদ্ধদেব অনেক সময় তাঁর গল্পগুলো শ্লেষ ও কূটাভাসের মধ্য দিয়ে সমাজের নানান বাস্তব ছবি উদঘাটিত করেছেন।

'সুপ্রতিম মিত্র' গল্পে প্রতিভাবান শিল্পী সুপ্রতিমের সাংসারিক অর্থে সফল অধ্যাপকের জবানিতে গল্পটি বলা হয়, বন্ধুটি সুপ্রতিমের দারিদ্র্য এবং তার নিজের প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে আত্মবিশ্লেষণ করে, নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা কঠিন বলেই হয়তো তার ব্যঙ্গে হুল থাকে না। তার থেকেও বড়ো কথা হল, এই শিল্পী যদি বুদ্ধদেবের সত্তার এক অংশ হয় তাহলে এই অধ্যাপক বুদ্ধদেবের অস্তিত্বের বাস্তব রূপ, ফলে গল্প লিখতে বসে তিনি নির্লিপ্ত ভঙ্গি গ্রহণ করেন, আর তাতে এই সন্দেহ আরও জেগে ওঠে যে, তিনি যে সব ব্যপার নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন তা তাঁর নিজের কাছেই শ্রদ্ধেয়, আর তাই এক্ষেত্রে তাঁর ব্যঙ্গ এত নির্বিষ।

বুদ্ধদেবের গভীর মূল্যবোধে আশ্রিত একটি গল্প 'মেট্রোতে বুড়ি'। সাধারণ বেদরদি মানুষের মনে যে পাপবোধ ও বিবেকবোধ ঘুমিয়ে থাকে ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় যাকে বলে সুপার ইগো তারই ঠিকানা এই 'মেট্রোতে বুড়ি' গল্পটি। গল্পটিতে দুই অল্প বয়সী বন্ধু সিনেমা দেখতে যাবে বলে বেরিয়েছে। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে, এমন সময় পথে এক বুড়ি এসে দাঁড়ায়। তারা একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল— ভিখিরির জ্বালায় কোনখানে কি শান্তি আছে। তাদের মধ্যে এক বন্ধু বলে উঠল— ''ভিখিরি দেখলে আমার বড়ো ঘেন্না করে, তার উপর ভিখিরিদের মধ্যেও এমন বীভৎস কঙ্কালমূর্তি চট করে চোখে পড়ে না।''[১৯] ওরা দু'জন এটা ভুলেই গেছিল যে ভিখিরিরাও আসলে মানুষ ওদের ভাগ্যের দরুণ আজ ওরা ভিক্ষা করছে। এসব অনুভব করার বদলে ছেলে দুটি বুড়িটিকে নিয়ে হাসাহাসি করছে— ''ও দেখতে কুৎসিত, বিশ্রী, ওর নুয়ে পড়া শরীর থেকে যেন একখানা কাদায় গড়া হাত বেরিয়ে এসে শূন্যে ঝুলে রয়েছে। কেমন ধুঁকছে। ঠিক কুত্তার মতো।''[২০] তারপর তারা দু'জনে স্থির করল বুড়িটিকে মেট্রোতে নিয়ে যাবে। এরপর

তরুণ দু'টি সেই বুড়িকে আবিস্কার করে মেট্রোর ভেতরে তাদের সারির কয়েকটা চেয়ার পরে। ঠিক সে বসে আছে চেয়ারে, শরীর নুয়ে পড়া, একখানা কাদায় গড়া হাত সামনের দিকে বাড়ানো। এবারেই ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে শুরু করে। টিকিট কাউন্টারের সামনেও তারা দেখে কোনো জাদু বলে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে সেই বুড়ি, সেই কাদায় গড়া হাত বের করে। সিনেমা শেষ না হতেই দুই বন্ধু বেরিয়ে আসে উজ্জ্বল রোদে ভরা রাস্তায়। ফিরতি ট্রামে দু'জনেই উৎকণ্ঠিত, আতঙ্কিত। কিন্তু কাউকে আর দেখা যায় না। তবে শান্তিতে থাকা সম্ভব হয় না, ফিরে আসে স্মৃতি। পরদিন খাবার সময় তার মা জানান— "কী কাণ্ড! কাল দেখি আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় গাছের নীচে একটা বুড়ি মরে পড়ে আছে।"[২১] সে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো যে গতকাল দুপুরবেলা সে বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই ঘটনাটি ঘটেছিল। সে মনে মনে নিশ্চিত হয়ে গেছিল যে এই বুড়িটি গতকাল তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সেই বুড়িটিই। অর্থাৎ বুড়িটি ভূত ছিল।

পাঠক হিসেবে গল্পটি পড়ার পর চমকে উঠতে বাধ্য হই। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে এখানে ভৌতিক ক্রিয়াকলাপের চিহ্ন মাত্র নেই। বরং কিশোর পাঠ্য গল্পটির গভীরে সমাজতাত্ত্বিক এক মনকে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখি। এ 'ভূত' ওই দুই মধ্যবিত্ত দুলালের মনেরই বাহ্য প্রক্ষেপ। কলকাতার বাস্তব সংকট, বাস্তব শ্রেণীবৈষম্য মধ্যবিত্তের ভণ্ডামিভরা সৌন্দর্যবোধ এবং মধ্যবিত্তের অমানবিক অসাড় প্রতিক্রিয়া সবই কৌশলে উপস্থাপিত হয়েছে। বাস্তবকে বিবৃত এবং ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এমন সুনিপুণ পরাবাস্তবতা ব্যবহার বাংলা গল্পে বিরল। খাবার টেবিলে বুড়ি ভিখারিনির মৃত্যু প্রসঙ্গ এবং খেতে না পাবার যন্ত্রণা

আরো দ্বিধাহীনভাবে প্রশ্নটি উত্থাপন করে, এই সমাজব্যবস্থায় কি নিশ্চিন্তে খাওয়া সম্ভব, যদি বাস্তবকে মনে রাখা হয়? ১৯৩২ নাগাদ 'ভূতের ভয়' প্রবন্ধে যে 'কাল্পনিকতা'র দোহাই দিয়ে 'ভূতের গল্পে'র সপক্ষে জোর সাওয়াল করেছিলেন বুদ্ধদেব, এখানে সেই 'কাল্পনিকতা'-কেও খুঁজে পাওয়া কঠিন, বরং বাস্তব প্রতিমুহূর্তে শরীরী রূপ নিয়েছে। কেউ বাস্তবকে ঔদাসীন্যে, বিরক্তিতে দূরে ঠেলে দিতে চাইলে, সমাজকে উপেক্ষা করলে, বাস্তব তার শোধ নেবে, ভয় দেখিয়ে প্রতি মুহূর্তে মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া-পালাবার পথ নেই।

''হায় মানুষ, ছায়ার মোহে পাগল,
শাস্তি তার এই তো চিরন্তন—
কেবল চায় বদল, বাসা-বদল।''[২২]

'মেট্রোতে বুড়ি' প্রকাশিত হবার কয়েকমাস পরে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে 'বন্দেমাতরম' গান প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব জানান, 'আপনার কি মনে হয় না আমাদের জাতীয় আন্দোলনের চেহারা একদিন বদলে যাবে, যখন যুদ্ধটা হবে ইংরেজ আর ভারতীয়ের মধ্যে নয়, যে ধনতন্ত্রের ইংরেজ ও ভারতীয় উভয়েই অংশীদার তার সঙ্গে দেশব্যাপী বিরাট শ্রমিকশ্রেণীর'। চিঠিটির তারিখ ১ জানুয়ারি ১৯৩৮। এত স্পষ্ট, দ্বিধাহীন ব্যাখ্যায় জাতীয়তাবাদের এমন মার্কসীয় সমালোচনা সে সময়ে অন্য কেউ করেছেন কিনা জানি না।

বুদ্ধদেবের লেখা পড়তে গিয়ে এমন একটা সন্ধানের আশ্বাস কোনো কোনো সময়ে জেগে ওঠে, যখন তিনি এইভাবে বলেন : 'রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ বেছে নিতে হলে আমাদের খুঁজতে হবে কোথায় তাঁর

দুই সত্তায় সামঞ্জস্য ঘটেছে, একটা অন্যটাকে ছাপিয়ে ওঠেনি, কোথায় কবিত্বের দিকটা গল্পের সঙ্গে এমনভাবে মিলেমিশে আছে যে কোনটাকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া যায় না।"[২৩] বুদ্ধদেব মনে করেন যে কবিকে বাদ দিয়ে কথাশিল্পীর বিচার চলবে না। যেখানে কবি আর কথাশিল্পীর সম্পূর্ণ সংগতি ঘটাতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ, সেখানেই ক্ষতি হয়েছে উপন্যাসের। বিচারের এই মাত্রাটি মনে রেখেই কথাসাহিত্যকে বুঝতে চান তিনি এবং এই সংগতি সাধনের সবচেয়ে সার্থক দৃষ্টান্ত তাঁর মনে হয় 'গল্পগুচ্ছ'কে।

'মেঘ ও রৌদ্রের' মতো গল্পের কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব স্বচ্ছন্দেই আমাদের নিয়ে যেতে পারেন 'পুনশ্চ'র কোনো কবিতায়— 'দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি/লজ্জা দিয়ো না।' এই কবিতার মধ্যে চিরকালীনতার যে পটখানি দুলিয়ে দেওয়া আছে, যার সামনে দাঁড়িয়ে মনে করা যায়— 'এই ব্যথাকে আমরা বলে ভুলব যখনি/তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে'। যেখানে অতি বৃহৎ বিশ্বের অম্লান মহিমার সামনে যে কোনো ব্যক্তিমানুষের দুঃখ ভিন্ন একটা চেহারা পেয়ে যায়, সেখানকার স্পর্শ পেয়ে আমাদের দৈনন্দিনের জীবনকথাগুলি তুচ্ছ কাতরতার বাইরে চলে যায়, ক্ষুব্ধতা মিলিয়ে যায় বেদনায়। শুধু 'মেঘ ও রৌদ্র'-ই নয়, 'গল্পগুচ্ছ'-র অনেকগুলো গল্প থেকেই বুদ্ধদেব তুলে আনেন বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ নির্বিকার উদ্রাসীনতার সঙ্গে মানবজীবনের ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক ঘটনাবিক্ষোভের প্রতিতুলনা।

বুদ্ধদেব বসু লক্ষ করেছেন কীভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তায় রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজকে বড়ো করে তুলেছেন। কিন্তু, কেন তা তুলেছেন? আর কোনটাই বা সে সমাজ? ইংরেজের চোখে আমরা কতই ছোটো, উপনিবেশগত দিক থেকে সেটা

মনে রাখতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই জন্যেই, তার প্রতিস্পর্ধিতায়, আমরা অর্জন করতে চাই 'আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু গম্ভীর, যাহা-কিছু মহৎ তাহা সমস্ত উদবোধিত করিবার, আকৃষ্ট করিবার, ব্যাপৃত করিবার' কোনো একটি ক্ষেত্র। সেটাই আমাদের সমাজ। এই সমাজকে, 'এই ঐক্যের আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে সন্ধান' করাটাই আমাদের কাজ। আর এরই জন্য আজ আমাদের 'নিভৃত চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন'। যে মানবধর্মে আমাদের মধ্যে 'যাহা-কিছু গম্ভীর, যাহা কিছু মহৎ' তার উদবোধন হতে পারে। পৌরাণিক ভারত, মধ্যযুগের ভারত আর আধুনিক ভারত থেকে কিছু চরিত্র তৈরি করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ, আর তারপর এক আত্মশক্তির আবাহন করেন 'নৈবেদ্য'র কল্পিত ভারতে। 'ইংরেজের চক্ষে আমরা কতই ছোটো'-র বিপরীতে এক গৌরবসত্তাকে এভাবে চোখের সামনে নিয়ে আসতে চান তিনি। এই চাওয়ার মধ্য দিয়ে সেই ভিতরকার শক্তিকে খুঁজি আমরা, যা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে চলে যায় সমাজে, সমাজ ছাড়িয়ে দেশে, দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বে এবং বিশ্বকে ছাড়িয়ে পরমে।

বুদ্ধদেব বসুর 'একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু'-র 'নাম' গল্পটি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে একটি। বাংলা ও ভারতীয় সাহিত্যে প্রথমসারির গল্পগুলির একটি তো বটেই এমনকি বিশ্বসাহিত্যেও এরকম প্রাণময় গল্প কম আছে। জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এক পল্লিবিদ্যালয়-শিক্ষকের বাংলা ভাষায় অভিধান রচনার সংগ্রাম ও সিদ্ধিই এর কাহিনীভাগ, কিন্তু গল্পের সবটুকু নয়। বিভিন্ন চরিত্রের আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে কিছু দৃশ্যের হালকা রেখাঙ্কনের মাধ্যমে, কয়েকটি আপাততুচ্ছ তথ্য গল্পের ছলে পরিবেশন করে বুদ্ধদেব কার্যত প্রকাশ করেন স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের কিছু তরঙ্গ, যে

ইতিহাস তরঙ্গে দোলায়মান একটি দেশের ভাগ্য নির্ধারণ হয়, আবার সেই একই ইতিহাসের ধারায় সমান্তরাল এক ব্যক্তিমানবের জীবননাট্য বয়ে চলে আপন লক্ষ্যে স্থির থেকে, ব্যক্তিগত শোক-দুঃখ-দারিদ্র-বঞ্চনা উপেক্ষা করে এবং শেষপর্যন্ত জয়ী হয় সেই ব্যক্তিমানব, যার জীবন রাষ্ট্রিক জীবনের মতো ঘটনাবহুল নয় ঠিকই, কিন্তু বেঁচে থাকার সার্থকতায় গরীয়ান, যেহেতু সেই ব্যক্তিমানবের জীবনও সাধনা সার্থক ও অবিচ্ছেদ্য।

একটি গল্পের মাধ্যমে বুদ্ধদেব অনেকগুলো কাজ করেন একই সঙ্গে। বিস্তীর্ণ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিমানবের জীবনকাব্য রচনা করা উপন্যাসে সম্ভবপর, কিন্তু ছোট গল্পে কঠিন। এই কঠিন কাজটিই বুদ্ধদেব অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে। সাধারণভাবে বুদ্ধদেবের গল্পে যখন কোনও ব্যক্তিচরিত্রের ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শিত হয়, তখন সেই ক্রিয়াকলাপ ঘটে থাকে ব্যক্তিগত কারণেই। কিন্তু 'একটি জীবন'-এ শত বিপত্তির পর ব্যক্তিমানবের বিজয়পতাকা ওড়ানোর উজ্জীবনকারী বার্তাটি ছাড়াও কান পাতালে এক বিস্তীর্ণ সময়ব্যাপী একটি দেশের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের স্পন্দন শোনা যায়। গল্পটি সার্থক এই জন্য যে এখানে বৃহৎ জনজীবনের লীলাভূমিতে ব্যক্তিমানবের কীর্তিস্তম্ভ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাহিনি নির্ভর গল্প বুদ্ধদেব বড়ো একটি লেখননি। বস্তুত 'একটি জীবন' ও 'বেহালা-বিপিন'-এর মতো গল্প এটাই আবার প্রমাণ করে যে কাহিনি নির্ভর গল্পেও বুদ্ধদেব সিদ্ধহস্ত।

'একখানা সাবান ও একটি মেয়ে'-তে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অবমাননা-নিঃসঙ্গতার গ্লানি উপেক্ষা করে গোপনে সঞ্চিত শেষ পুজি দিয়ে মনোমুগ্ধকর ও মহার্ঘ দ্রব্যাটি কেনে সুনীল, কারণ ওই বস্তুটিকে দৈনন্দিন জীবনের ক্লেদ থেকে

পরিত্রাণের মাধ্যম বলে মনে হয় তার, সেটির আবেশসঞ্চারী ভূমিকা তার কাছে অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় ভালোবাসার নারীর কৃত্রিমতাসর্বস্ব ব্যক্তিত্বের, শূন্যগর্ভ জীবনের পরিচয় পেয়ে। বাস্তবের ক্লিন্নতা থেকে সাময়িক মুক্তির জন্য সুনীল যেভাবে প্রায় অবাস্তব কাণ্ড করে দামি সাবান কিনে, সেভাবেই 'হৃদয়রঞ্জনের সর্বনাশ' গল্পে হৃদয়রঞ্জন ও মেসবাড়ির স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে ফুটে ওঠা বিচিত্র ছবির মাধ্যমে ভুলে থাকতে চান প্রাত্যহিকতার ক্লান্তি। বস্তুজগতের বিশুষ্কতা অতিক্রম করার জন্য 'নিজস্ব বাস্তব' গড়ে তোলা এবং লৌকিক বাস্তবে আঘাতে সেই 'নিজের বাস্তব'-এর অবলুপ্তির মধ্যেই গল্প দুটির শৈল্পিক ব্যঞ্জনা।

'হাওয়া-বদল' গল্পে মণিকা-রমেন তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী সুবোধকে যে শেষপর্যন্ত গ্রহণ করে, সেই অস্বাভাবিকতা স্বাভাবিক মনে হয় আমাদের কাছে। যেহেতু স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনচ্যুত রমেন-মণিকা ক্লেশকর জীবন যাপনের মাধ্যমে মানুষ হিসেবে পরিণত হয়েছে ততদিনে জীবনের সুকঠোর অভিজ্ঞতা তাদের শিখিয়েছে উদার ও সহনশীল হতে। তাদের চারিত্রিক পরিবর্তন অহিতকারী সুবোধকে অমলিনচিত্তে নতুন করে বরণ করার অবাস্তবতাকে স্বাভাবিক বাস্তব ঘটনা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করে। রমেন-মণিকার ভালোমানুষি তাই বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয়। একইভাবে বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় 'একটি কি দুটি পাখি'র অন্তর্ভুক্ত 'মুক্তি' গল্পে মিনু-তিনু মায়ের যত্নে সাজানো আলমারির ভেতরে পুতুলগুলির নাগাল পায় যেভাবে। 'একখানা সাবান ও একটি মেয়ে'-তেও অস্বাভাবিকতা রয়েছে, কিন্তু তা অস্বাভাবিক মনে হয় না কখনোই। যে তীব্র অভাব অনটনের জ্বালায়, ব্যর্থতাবোধে কোণঠাসা হয়ে পড়ে সুনীল, তার ফলে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া দশ টাকার নোটটি হয়তো সাময়িক চাপ থেকে মুক্তি দিতে

পারত তাকে, এবং সেটাই ঘটনা হিসেবে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু দশ টাকার নোটটি খুঁজে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে যে বেপরোয়া মানসিকতা জন্ম নেয়, তাকে উসকে দেয় গোটা পরিস্থিতির বিরুদ্ধাচার করতে, সেটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত হয়েছে। ঘটনার ক্রমবিন্যাস এবং নির্মাণের উৎকর্ষ সুনীলের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস, মধ্যবর্তীকালীন উৎকণ্ঠা ও মনোকষ্ট এবং অন্তিম হতাশা সার্থকভাবে প্রকাশ করে।

বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যে একাধিক কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ও স্বনামধন্য। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই সত্তার কোথাও না কোথাও কোনও অপ্রাপ্তি, কোনও শূন্যতা, কোনও ব্যর্থতাবোধ সক্রিয় থাকে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে মনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় বিষয় হলেও, ছোটগল্পে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত মনোজগৎকে অগ্রাধিকার দেননি। মনের হরেক খেলা অনেক সময়ই পরদার আড়ালে চলতে থাকে ঠিকঠাক, কিন্তু সরাসরি আসর জমায় বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ। স্ব-নির্বাচিত গল্প পর্যন্ত এই ধারাটি অব্যাহত। তাই স্ব-নির্বাচিত গল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত রচনাই ছোট গল্পের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দে গতিশীল। সেখানে সমাজের বাস্তব ঘটনা উপঘটনা, পারিপার্শ্বিক ও সমসাময়িকতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখ, বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত গল্পগুলোকে সজীব রাখে। তাই এই গল্পগুলোতে জীবনের এক একটি অংশের আকস্মিক উন্মোচন থাকে, সাধারণভাবে যুক্তিসিদ্ধ বাস্তবসম্মত উপদেশ এদের বিষয়।

'প্রেমপত্র ও অন্যান্য গল্প' বুদ্ধদেব বসু রচিত শেষ গল্প গ্রন্থ। মাত্র ছ'টি গল্প সংকলিত এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে এক পরম বিস্ময়, ওই ছ'টি গল্পের

প্রকাশকাল ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রেমপত্র ও অন্যান্য গল্প লিখে বুদ্ধদেব বসু জীবনের অবশিষ্ট বছরগুলিতে যে আর একটিও গল্প লেখেননি, তা হয়তো এই জন্যই যে এই গ্রন্থে তাঁর অন্বিষ্ট শিল্প রূপের সর্বাধিক নিকটবর্তী হন তিনি যতটা তাঁর প্রতিভা ও কুশলী দক্ষতার পক্ষে সম্ভব, ছোট গল্পের প্রকৃত নমুনা বলতে তিনি যা বোঝেন তার সবটুকু এই ছ'টি মাত্র গল্পে উজাড় করে দিয়ে ছোট গল্পের আসর তিনি ত্যাগ করেন চিরকালের মতো। এই ছ'টি রচনায় ছোট গল্পের সুপ্ত সম্ভাবনা উদঘাটনের জন্য তিনি সন্ধান করেন বহু আকর্ষিত ক্ষেত্র, দুঃসাহসিক অভিযান চালান চেতনার দুর্গম পথ ধরে, নামেন অভিজ্ঞতার অতলান্ত গহ্বরে। এই প্রত্যেকটি গল্পেরই পরিণতি কেন্দ্রীয় চরিত্রের মৃত্যু, নয়তো কোনো না কোনভাবে মৃত্যু ছায়া ফেলে। বস্তুত পক্ষে, মৃত্যু চেতনার এমন অসামান্য বর্ণনা তাঁর বিভিন্ন গল্পে স্থান পেয়েছে। যা প্রমাণ করে বুদ্ধদেব তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে কীভাবে মৃত্যুকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে গেছেন তাঁর শেষ পর্যায়ের গল্পে। এই প্রত্যেকটি গল্পেই বাস্তব ও অবাস্তব, জড়জগৎ ও লৌকিক উপাদান ও কল্পনার ছায়াসরণি, চেতনাগ্রাহ্য উপরকরণ, অতীত ও বর্তমান, জীবন ও মৃত্যু, তথ্য ও সত্যের সংঘাত চলে বহুস্তরে। গল্পগুলিতে কোথাও বা কাহিনির অভিনবত্ব বাস্তব জগতের দ্বার খুলে দেয়, কোথাও আবার স্মৃতির ক্ষীণ রশ্মিরেখা পাল্টে দেয় বর্তমান অস্তিত্বের তাৎপর্য। 'প্রেমপত্র'-তে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বিরূপাক্ষ রায় দূরদেশস্থ প্রেমিকার পাঠানো অদ্ভুত ভাষায় লেখা চিঠিটির যে মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না জীবনের বহু বছর কাটিয়ে সেই ব্যর্থ প্রয়াসের পটকথাই শুধু নয় গল্পটি, এক আত্মসচেতন ধীমান ব্যক্তির আত্মসমীক্ষাও বটে, সেইসঙ্গে জীবন ও জগতের সঙ্গে

নিজের সম্পর্কের চরিত্র নির্ণয়ের ভাষ্যও বলা যেতে পারে একে।

'অনুদ্ধারণীয়'-তে বিনায়ক দত্ত নামক প্রবীণ লেখক ও তার একদা অনুরাগী ও বর্তমানে বিপরীত জীবনবোধসম্পন্ন অমিত বিশ্বাসের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত এবং সেই কারণে অমিত-কৃত বিনায়ক হত্যা কোনও কৃত্রিম বা অতিনাটকীয় নির্মাণ হিসেবে না দেখে সমাজের বাস্তব উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। 'মৃত্যুর আগে জাগরণ'-এ মুমূর্ষু ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রাচীন পুথি বিশেষজ্ঞ দেবকীদাস মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে অবলুপ্ত প্রেমের সন্ধান এবং 'প্রেমিকারা'-য় এক চল্লীশোত্তীর্ণ সাহিত্য সমালোচকের জীবনে নারীর অবিরাম আসা যাওয়া থেকে উদ্ভূত বিষাদ ও বেঁচে থাকার ক্রমশ অনীহা শেষ জীবনে শূন্যময় প্রশান্তির বার্তা শোনায়। 'আমি, আমিতা সান্যাল'-এ নীলকণ্ঠ রায় নামক এক মৃত কবির পরোক্ষ উপস্থিতি কেন্দ্রীয় চরিত্রের ঘুমন্ত সত্তা জাগ্রত করে, তার দৈনন্দিন ও সামাজিক পরিচিতির ভিড় ঠেলে তার অন্তঃস্থিত ব্যক্তি মানুষটিকে সামনে নিয়ে আসে।

এই গ্রন্থের সর্বাধিক চমকপদ গল্প 'ভূস্বর্গ'। কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব কখনওই কাহিনিভাগে কল্পনার সীমা বাড়াননি। 'ভূস্বর্গ'-তে তিনি এমন কাহিনিভাগ গঠন করেন যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে নেই। বুদ্ধদেবের অন্ত্যপর্যায়ের গল্পে 'ভূস্বর্গ' একটিমাত্র দৃষ্টান্ত যেখানে কাহিনিভাগ জয়ী হয় প্রকাশভঙ্গিমার উপর, কল্পনার সীমা অতিক্রম করে ভাষার লাবণ্য। এই গল্পটির ভৌগোলিক পরিবেশে, ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট, বৈজ্ঞানিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষার বিশ্বাসযোগ্য নির্মাণ এবং এক অলীক জগতের বাস্তবসম্মত উপস্থাপন পাঠকের মনে গোটা ব্যাপারটার অস্তিত্বের ছাপ ফেলতে সমর্থ হয়।

'প্রেমপত্র'-র গল্পগুলির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অন্ত্যপর্যায়ের বুদ্ধদেবের উপলব্ধির একাধিক কথা যা কখনও নিজেরই সঙ্গে নিজের তর্ক, জীবনও জগৎকে ভিন্ন কোণ থেকে দেখার প্রয়াস, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত নিয়ে অক্লান্ত অনুধ্যান, দ্বিধাগ্রস্ত কোনও মতপোষণ। আবার কখনও কথাগুলো এমনভাবে বলা হয় যেন বলে নিজেই কৌতুক অনুভব করছেন, কোনও কপট মন্তব্য দ্বারা বিভ্রান্ত করতে চাইছেন পাঠককে, বিচিত্র ভাবনায় পাঠককে জোর করে টেনে এনেছেন— ''সূর্য ওঠামাত্র আলোকিত হয় জগৎ-তা কি চেষ্টা করে বুঝতে হয় আমাদের? যে পরিত্যক্ত বন্ধ ঘরে বহুকাল ধরে অন্ধকার জমে আছে, আর বৈদ্যুতিক বৈকল্যের ফলে যে ঘর পাঁচ মিনিট আগে অন্ধকার হলো— একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালামাত্র দুটোতেই তো একই সময়ে আলো ফুটবে। বহুকালের পুঞ্জিত তিমির কাটাবার জন্যও এক লহমাই যথেষ্ট। তাহলে জ্ঞানে কী লাভ? এক মুর্খ বনচর দস্যু আকস্মাৎ ছন্দোবন্ধ শ্লোক উচ্চারণ করেছিলো, এক চতুর তস্কর নিহত জন্তুর অন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে প্রথম বীণায় তার বেঁধেছিল। আমাকে এবার সব শিক্ষায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। ভান করতে হবে যেন আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভুলে গিয়েছি। একেবারে নতুন করে আরম্ভ করতে হবে আমাকে।''[২৪]

'প্রেমপত্র'-র প্রতিটি গল্পই বাস্তব জীবন ও শিল্পের, বোধ ও অভিজ্ঞাতার, বক্তব্য ও উপলব্ধির ভেদরেখা। ভাব ও ভাষার ঐক্য, চিন্তাপ্রণালীর সুনির্দিষ্টতা গল্পগুলিতে সজীব ভাস্কর্যের রূপ দেয়, যারা সমান্তরালভাবে বিশৃঙ্খল ও আবর্জনাময় জীবনের সমালোচনা ও ক্লান্তিহীন বিশোধন করে চলে। লৌকিক জীবনের বাস্তবতার পাশে শিল্পের স্থায়িত্ব, সমাজজীবনে ব্যক্তিমানবের দ্বীপময় অস্তিত্ব, শরীরি প্রেমের উপস্থিতি, নিঃসঙ্গতা থেকে নিংড়ে তোলা অভিজ্ঞতায় গল্পগুলি সমৃদ্ধ।

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও রাজনৈতিক পটভূমি নিয়ে বর্ণিত গল্প বুদ্ধদেব বসুর 'অসমাপ্ত গল্প'। গল্পটিতে আমরা দেখি একটি দরিদ্র যুবক শহরে এসেছে কলেজে ভর্তি হবে এই আশায়। তার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ অথচ বিদ্যার্জনের উৎসাহ অসীম। যুবকটির নাম গণেশ মণ্ডল, সে মেট্রিক থার্ড ডিভিশনে পাশ করে শহরে এসেছে কলেজে ভর্তি হবার স্বপ্নে। তার কোন আশ্রয় নেই তাই সে অনেক অনুনয় বিনয় করে তার কলেজের ইংরাজী শিক্ষকের বাড়িতে আশ্রয় নিল। এই শিক্ষকের একটি সুন্দর পরিবার আছে। তার স্ত্রী সরমা গণেশকে প্রথমে গ্রহণ করতে পারছিলো না কিন্তু পরবর্তীতে গণেশই সরমার সবকিছু হয়ে উঠে। চাষার ছেলে গণেশের চোখে অসীম তেজ ছিল। সে একেবারে নিঃস্ব হাতে গ্রাম থেকে এসেছিল। সরমা শোবার জন্য বিছানার কথা বলায় সে বলে উঠেছিল—

''একটা ছেঁড়া মাদুর টাদুর হলেই চলে যাবে আমার। এই চাঁদর দিনের বেলায় গায়ে দিই, আর রাত্তিরে ওটা ভাঁজ করে নিলেই বালিশ হয়ে যায়। আর কিছু আমার লাগবে না। সব আছে।''[২৫] সরমা তার আদরে-স্নেহে গণেশকে একেবারে নিজের ছেলে বলে গড়ে তুলল। সরমা গণেশকে বিদ্যাসাগর বলে ডাকে। সরমার তত্ত্বাবধানে বিদ্যাসাগর বাড়তে লাগল। কাপড় চোপড়, চলাফেরা সবই যেন অন্যরকম হয়ে গেল, কিছুটা বাবু বাবু ভাব। তারপর সেকেন্ড ইয়ারে উঠে গুটিপোকা পুরোপুরি প্রজাপতি হয়ে গেল। আটচল্লিশ ইঞ্চি বহরের মিহি ধূতি, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, দেহে নবযৌবনের আভা। একবছর আগের গণেশের সাথে এখনকার গণেশের কোন মিলই নেই।

তারপর দেখা যায় গল্পটিতে নতুন মোড়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে

জাপানি যুদ্ধ বাধলো, আর বড়দিনের ছুটি আসতে না আসতে সমস্ত কলকাতা যেন মৃত্যুভয়ে খেপে গেলো। আমাদের শিক্ষক মহাশয়ের সমস্ত পরিবার শিমূলতলায় বাড়ি ভাড়া করে আশ্রয় নিল, গণেশও সঙ্গে গেলো। গণেশ এখন পড়াশুনা ছেড়ে রাজনীতিতে মন দিল। সে রাজনীতি বিষয়ক বিভিন্ন পাঠ্যবই পড়ে জানার চেষ্টা করে। গণেশের এখন পড়াশুনোয় কোন মন নেই। একদিন সে বলে উঠে— ''পরীক্ষার পড়াও পড়ছি বইকি। কিন্তু তাতে মন দিতে পারি না। পৃথিবীভরে যখন আগুন জ্বলছে তখন একটা পরীক্ষা দেবার কথা ভাবতেও হাসি পায়।''[২৬]

গণেশ একেবারে মনে প্রাণে সমাজসেবার কাজে জুটে গেল। আজ এই সভা, কাল ছাত্র সমিতির বৈঠক, পরশু রিলিফ ক্যাম্প এই নিয়ে ব্যস্ত, আর তাদের সংগঠনের প্রেসিড্যান্ট হচ্ছেন সরমা। সরমাও নিজেকে মনে প্রাণে ঠেলে দিয়েছে সমাজসেবায়। গণেশ এখন এতটাই ব্যস্ত যে তার মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়েও সে যায়নি। সে ছোটো খাটো 'ছাত্র নেতা' হয়ে উঠেছে। সে সভা আহ্বান করে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতা দেয়, তার নাম খবরের কাগজেও ওঠে। 'গণ-মণ্ডল' ছদ্মনামে প্রবন্ধ লেখে— তাতে ভাষাবিন্যাসের যতই ভুল থাকুক। কেউ কেউ তার লেখা পড়ে বলেন যে 'এই হচ্ছে ঠিক যুগোপযোগী লেখা'। সরমার বাড়ির একতলাটি বলতে গেলে ছাত্র সমিতির অপিশে পরিণত হয়ে গেছে। যে পল্লীযুবক চোখে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে শহরে এসেছিল, পড়াশুনা করে মানুষ হয়ে নিজের পরিবারের দারিদ্রতা দূর করবে বলে। সেই যুবকটির কাছে এখন নিজের পরিবার বলে কিছু নেই। এত সুযোগ পাওয়ার পরও পড়াশুনা তার হয়নি বরং যুবনেতা হয়ে উঠল। আসলে সেই যুদ্ধের ফলে আহত ক্ষয়িষ্ণু সংশয়ী যৌবনের পায়ের তলা

থেকে যখন সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধগুলি ক্রমশই সরে সরে যাচ্ছে, যখন বাস্তব পৃথিবীর চারিদিকে আশার আলো একটু একটু করে নিভে আসছে, তখন সেই হতাশা-ম্লান, ধূসর পরিবেশে যৌবন রোম্যান্টিক স্বপ্নকে বুকে লালন করে বাচতে চেয়েছে। আর এরই ফলে গণেশ পড়াশুনা ছেড়ে যুবনেতা হয়ে উঠেছে। সে যেন কল্লোল গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছিলেন— 'যেমন শোক থেকে শ্লোকের জন্ম তেমনি তারুণ্য থেকেই কল্লোলের আবির্ভাব।'

'কল্লোল'-এ প্রকাশিত বুদ্ধদেবের প্রথম গল্প 'রজনী হল উতলা'র মতো তথাকথিত মর্বিত গল্পে যে দেহচেতনার যন্ত্রণা ও রহস্যের সূচনা হয়েছিল তা যেন এক নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। 'ভারতী' ও 'নারায়ণ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেহচেতনাকে অবলম্বন করে প্রাক-রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র যে সাহিত্য সৃষ্টির নতুন আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, কল্লোল-এর তরুণ স্পর্ধিত বিদ্রোহীদের হাতে সেই আন্দোলন আরও ব্যাপক ও বিচিত্র রূপ গ্রহণ করেছিল। দেহকে ঘিরে প্রেমের রহস্যময় আর্তি ও অনুভব, দেহ ও আত্মার যে ক্রন্দন এবং বিরহের বেদনায় শরীর চেতনাকে বিশুদ্ধ করে তোলার জন্য নরনারীর যে যন্ত্রণা— তাকেই ধরবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যরসবাহিত সাংকেতিক ইমেজ বা শব্দচিত্রের মাধ্যমে।

বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যে আত্মমুখী রোমান্টিক স্বপ্নময়তার প্রতিচ্ছবি লক্ষিত হয়। এই চেতনায় যখন বুদ্ধদেব আবিষ্ট হন তখন যেন মনে হয়, তিনি বাস্তব সমাজের জীবনগত অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনি অনেক সময় ব্যঙ্গ কটাক্ষের মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব চেহারা উদঘাটন করেছেন। এই ব্যঙ্গ মুখ্যত

আভিজাত্যের বর্ণিল আবরণের অন্তরালস্থ নিষ্ফল অন্তঃসার শূন্যতার বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের। শিক্ষা, সংস্কৃতিতে, চিন্তায়, মননে এই সম্প্রদায় সমাজের অন্য শ্রেণী থেকে অগ্রণী কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটে তারা ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। এরফলে তারা সামাজিক মর্যাদা থেকেও অনেকাংশে বঞ্চিত। কেবল আর্থিক প্রাচুর্যের জোরে যারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সিংহাসন অধিকার করে রাখতে চায়, সে তথাকথিত অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাই এই ব্যর্থ বঞ্চিত বুদ্ধিজীবীদের আক্রোশ-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বুদ্ধদেবের এই পর্বের অনেক উপন্যাস ও গল্পে যেমন— সাড়া, সানন্দা, যবনিকা পতন, অতনুমিত্র সাবিত্রী বোস আর বুলু, ইত্যাদিতে প্রায়ই নায়কের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর অস্থিত্বের সংকট লক্ষিত।

বস্তুত বুদ্ধদেব প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর একই জীবনবোধ কখনও বা অন্তঃসারশূন্য সভ্যতার হৃদয়হীন কৃত্রিমতাকে কঠিন ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছে, আবার কখনও বা সমাজ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে, আঘাত করার নেতিমূলক প্রয়াস থেকে সরে এসে আপন রোমান্টিক স্বপ্নজগৎ গড়ে শেষপর্যন্ত প্রেমের মধ্যেই জীবনের আশ্রয় সন্ধান করেছে। এইভাবেই বুদ্ধদেবের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সামাজিক ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদ-প্রবণতা এবং আত্মমুখী নির্জন স্বপ্নাতুরতা— এই দুই তথাকথিত স্ববিরোধী প্রবণতা বিস্ময়করভাবে সহাবস্থান করেছে চিরদিন।

বুদ্ধদেব বসু যাদের দেখেছেন, অভিজ্ঞতায় পেয়েছেন তাদের কথাই গল্পে বলেছেন। তাঁর গল্পে দেখা যায় বিচিত্র মানুষ; তাদের সুখ দুঃখের কথা তিনি বলেছেন। আমাদের সমাজের বাস্তব উদাহরণ তার গল্পে খুঁজে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেব বসুর 'একটি জীবন' গল্পে বর্ণিত বাস্তবের আজও অবসান হয়নি। গল্পটিতে বুদ্ধদেব যে অভিধানকার গুরুদাস ভট্টাচার্যের ছবি এঁকেছেন সেই ছবির ব্যক্তিগত বহিরাশ্রয় দিকটি এককথায় অতুলনীয়। জীবনচরিত সত্যি সত্যি পড়তে পারা মানে তো একধরনের মূল্যায়ন করতে পারা। জীবনীর মূল্যায়নের মানদণ্ড সাহিত্যের সাধারণ্যে অবস্থিত। মানুষের জীবন নিয়ে যে জায়গাটার কথা আমরা সবাই ভাবি সেই জায়গাটাই সাহিত্য। সেই সাধারণ্যের সঙ্গে ভাষার বৈশেষিক তত্ত্বচর্চার সমীকরণ আজও অরচিত। বৈয়াকরণের বা অভিধানকাবের অস্তিত্বের মানে বুঝতে আমরা শিখিনি। সমাজে তারা যে থেকেও নেই, তাদের এই বিশেষ অদৃশ্যতা বুদ্ধদেবকে ভাবিয়েছিল। সে জন্যেই তিনি 'একটি জীবন' লেখেন। লিখতে গিয়ে তার কাছে জরুরি হয়ে ওঠে বাংলা পড়ানোর কাজ যে সংস্কৃত ভাষার কর্মীদের হাতেই রয়ে গেছে এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা।

গুরুদাস ভট্টাচার্য সংস্কৃতের পণ্ডিত। সংস্কৃত শিখেছেন, বাংলা শেখেননি। কিন্তু জাতে বাঙালি-বাংলাতেই কথা বলেন। একদিন তিনি উপলব্ধি করলেন যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত নয়, এমনকি সংস্কৃতের একটা অপভ্রংশও তাকে বলা যায় না— সে একটা আস্ত, সজীব, পরিবর্তনশীল, স্বাধীনভাষা, কোটি কোটি মানুষের কথ্যভাষা, মাতৃভাষা। গুরুদাস ভট্টাচার্য মনে মনে স্থীর করলেন তিনি বাংলা ভাষার একখানা অভিধান রচনা করবেন। আর এই অভিধান রচনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু সমাজের নানান বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরেছেন। গল্প যে মানুষের বাস্তব জীবনের ছবি আকে একথা প্রমাণিত হয় উক্ত গল্পে। এই গল্পে অভিধানটা কীভাবে লেখা হচ্ছে সেটাই এই কাহিনীর আসল ঘটনা, আর এই অভিধানটা লেখতে গিয়ে গুরুদাস ভট্টাচার্যকে কী কী প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেটাই ব্যক্ত হয়েছে।

অভিধান রচনাকালীন গুরুদাস ভট্টাচার্য শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরী ঘাটতে লাগলেন। একদিন কলেজ স্কোয়ারের এক বইয়ের দোকানে একটি যুবকের সাথে তার পরিচয় হল। যুবকটির কথা ফিরে ফিরে তার কানে বাজতে লাগল— ''আমি— গুরুদাস ভট্টাচার্য্যি, বাংলা ভাষার অভিধান রচনায় নিযুক্ত আছি— কী জানো তুমি বাংলা সাহিত্যের, বলো তো? ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিম, কিছু মাইকেল-ওখানেই শেষ। রবীন্দ্রনাথের নাম করলে যুবকটি— কেউ কেউ বলে তিনি বাংলা ভাষার জন্মান্তর ঘটিয়েছেন, তুমি তাকেও জানো না, কিছুই পড়োনি। আর এই নতুন লেখকরা— এই সুব্রত সেনকেই ধরা যাক— যুগে যুগে নতুন হয় বলেই ভাষা বেঁচে থাকে, সে শক্তি হারিয়ে ফেললেই মরে যায়। আর অভিধান যদি সেই বিবর্তনের ছবি দিতে না পারে, তাহলে অভিধানের অর্থ কী?''[২৭]

গুরুদাস ওঠে পড়ে লাগলেন তার অভিধান রচনায়। এদিকে সংসারে দেখা দিল নানা প্রতিকূলতা। তার বিয়ের উপযুক্ত এক কন্যা টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল, তার চিকিৎসায় গুরুদাসের অনেক টাকা ব্যয় হয়ে গেল, তার বড় মেয়ে ভবানী বিধবা হয়ে তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাবার কাছে এসে দাড়ালো, এখন গুরুদাসের পরিবারে অনেক লোক, দেখা দিল আর্থিক সংকট। কী করা যায় এখন কী হবে গুরুদাসের অভিধানের। তারপর কয়েক বৎসর যাবার পর তার স্ত্রী হরিমোহিনীর বাতে ধরেছে, কাজকর্ম কিছুই করতে পারে না, সারা সংসারটি আগলে ধরে রেখেছে গুরুদাসের বিধবা কন্যা ভবানী। গুরুদাসের জীবনের আলোর প্রদীপ তার ছেলে নবেন্দু এখন উপার্জন করতে শুরু করলে গুরুদাসের কাঁধের ভার অনেকটা হালকা হয়েছে। এভাবেই চলতে থাকা অবস্থায় নবেন্দু

একদিন চলতি ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে মারা গেলো। গুরুদাস ভট্টাচার্যের পরিবারে দুঃখের করাল ছায়া নেমে এলো। এদিকে গুরুদাসের অভিধানের কাজ যেন প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো, ছাপা 'ফ' এর পরে আর এগোলো না; ছাপার দাম চারগুণ, কাগজ পাওয়া যায় না— কিছুই হবার নেই, এদিকে এতকাল তাদের বাড়ির ভাড়া ছিল মাসিক সাড়ে সাত টাকা, হঠাৎ বাড়ি মালিক সতেরো টাকা দাবি করে বসলো, চালের মন চার টাকা থেকে একলাফে চল্লিশে পৌঁছে গেলো, এদিকে গুরুদাস চোখ নিয়েও কষ্ট পেতে লাগলেন। সব মিলিয়ে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন, কী হবে এখন কেমন করে চালাবেন সংসার? কেমন করে শেষ করবেন অভিধানের কাজ? এটাই ছিল তার কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

এদিকে দেশে চলছে তখন স্বাধীনতার যুদ্ধ। সমস্ত দেশ জুড়ে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, তারপর দেশ স্বাধীন হল। খুলনা পড়লো পাকিস্তানে। আবার এল গুরুদাসের জীবনে চরম সংকট, তার অস্তিত্বের সংকট এসে গেল, কিছুদিন দেখার পর উপায় না পেয়ে গুরুদাস তার সমস্ত পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে কিছু হেঁটে, কিছু ট্রেনে, মাঝে মাঝে নৌকোতে নদী পার হয়ে চলতে লাগলো। দশ দিন লাগলো তাদের কলকাতা পৌছতে। শেয়লদার স্টেশনে মুড়ি খেয়ে সাতদিন কাটলো, তারপর লরি বোঝাই দিয়ে গেলেন বনগাঁর ক্যাম্পে। সেখানে রোজ বেলা দুটোর সময় চাল-ডাল মেশানো কিছু একটা খাবার দেওয়া হয়। তা খেয়ে গুরুদাস একটু সুস্থ বোধ করলেন, কিন্তু হরিমোহিনীর আর্তনাদের আর বিরাম নেই, অবশেষে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মারা গেলো। দু-তিন মাস পর শেষপর্যন্ত কাঁচড়া পাড়ার কাছে রেফিউজী কলোনীতে আস্তানা পেলেন তারা।

সারি সারি বাশের ঘর, রান্নার একটু জায়গা আছে। কাছে পুকুর, একটু দুরে টিউব-ওয়েল, ভবানী ওরই মধ্যে গুছিয়ে নিলো।

গুরুদাস ভট্টাচার্য একটু নিঃশ্বাস ফেলে আবার তার খাতাপত্র বের করে বসলেন। একটা চোখে সম্পূর্ণ ছানি পড়ে গেছে, আর একটা চোখও নিষ্প্রভ। দু-বছরের মধ্যে পর পর অনেকগুলো খণ্ড ছাপা হয়ে গেলো, তার পরের বছর অভিধান রচনা শেষ হলো, সবগুলো প্রকাশিত হতে আরো দু'বছর কেটে গেলো। শেষপর্যন্ত সমাপ্ত হল গুরুদাসের জীবনের পুঞ্জির কাজ, বৃহৎ বঙ্গীয় অভিধান; বাহান্ন খণ্ডে প্রকাশিত হল, প্রায় ত্রিশ বছর লেগে গেলো অভিধানটি রচনা করতে। যখন আরম্ভ করেছিলেন তখন তিনি চল্লিশ বছরের, আজ তার মাথার চুল ধবধবে সাদা, পিঠ বেকে গেছে, গাল দুটো গহ্বরের মতো দেখায়, লোলচর্মে শিরা উপশিরা ফুলে উঠেছে। একটা চোখ অন্ধ, আর একটাতে অতি কষ্টে দেখেন। ইতিমধ্যে কলকাতায় তার অভিধানের কথা রাষ্ট্র হতে লাগলো— ''কে একজন গুরুদাস ভট্টাচার্য তিনি নাকি মস্ত অভিধান লিখেছেন, একটা কাজের মতোকাজ হয়েছে। মুখ থেকে মুখে ছড়ালো কথাটা : বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাহিত্যিকদের আড্ডায়, খবর-কাগজের আপিশে। যাঁরা কিনলেন তারা ভালো বললেন, যাঁরা কিনলেন না তারা আরো বেশি।''[২৮]

স্বাধীনতার পর পঞ্চম বর্ষ চলছে তখন। সরকারি তরফ থেকে সাহিত্যের জন্য গুরুদাসকে পুরস্কার ঘোষণা করা হল। সরকারি চিঠির উত্তরে ভবানী জানালো তার পিতা এখন পীড়িত, কোনো প্রকারেই কলকাতা যাওয়া সম্ভব নয়। অবশেষে একদিন কাচড়াপাড়া রেফিউজী কলোনীতে একখানা বিরাট গাড়ি এসে দাড়ালো। গাড়ি থেকে নামলেন একজন মন্ত্রী, দুজন উচুদরের রাজপুরুষ, দুজন চাপরাশি,

এবং সাংবাদিক, সরকারি কেরানি, এবং ক্যামেরা সমেত ফটোগ্রাফার। দুই দিকের বালক-বালিকা স্ত্রীলোকদের নয়ন বিস্ফোরিত করে দিয়ে গুরুদাসের ঘরে এসে দাড়ালেন তারা। বসার জায়গা নেই গুরুদাসের ঘরে তাই দাড়িয়ে দাড়িয়ে অনুষ্ঠানটি সারতে হয়েছে। গুরুদাসের বিছানার উপর রাখা হল একরাশ ফুল, সিল্কের ফিতেয় বাঁধা একশো টাকার নোটে পাঁচ হাজার টাকা। খুশিতে, আনন্দে, অভিমানে গুরুদাসের ছানি পড়া চোখটা স্থির হয়ে রইলো, অন্য চোখটায় কৌতুকের ঝিলিক দিলো হঠাৎ। সে দিনই বিকেলে তিনি মারা গেলেন। মরার আগে একটি কথা শুধু বলেছিলেন, ''টাকাটা তুলে রাখ, ভবানী। তোর কাজে লাগবে।''[২৯]

গুরুদাস ভট্টাচার্য অনেক কষ্টে নানান প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে এই অভিধানটি রচনা করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি সিদ্ধিলাভ করেন এবং সমাজের প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে অনেক দেরী হয়ে যায়। চারিদিকে তার নাম, তার যশ কিন্তু তিনি তা দেখতে পাননি কারণ তার জীবনের সময় ফুরিয়ে এসেছিল। বুদ্ধদেব বসু উক্ত গল্পটিতে গুরুদাস ভট্টাচার্যের এই অভিধানটি রচনার কালসীমার মধ্য দিয়ে সমাজের নানান বাস্তবতা উদঘাটিত করেছেন, যেমন আর্থিক সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট উদবাস্তু সমস্যা, দাঙ্গা, সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে রেফিউজি কলোনীতে দিন যাপন ইত্যাদি আরো বিভিন্ন ঘটনা।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাহিত্য জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন— দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, পরাধীনতা, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা প্রতিশ্রুতি, আন্দোলন ইত্যাদি, ফলে এর প্রতিফলন ঘটেছে তার কবিতা গল্প-উপন্যাসের পাতায়।

বুদ্ধদেবের নিজস্ব জীবনেও দেশভাগের প্রতিফলন বর্ণনা আছে। তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসুদের পরিবার দেশভাগের বলি হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে তারা ধনী না হলেও সচ্ছল গৃহস্থ ছিলেন। রেফিউজি হয়ে আসার পর চরম দুর্দশার মধ্যে পড়লেন তারা— আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ যেমন পড়েছিল। বাঁশের বেড়ায় ভাঙাচোরা ঘরে গাদাগাদি করে থাকা, কোনোদিন অর্ধাহার কোনোদিন অনাহার। এই পরিবারটির এই সময়কার দুর্দশার বর্ণনা পাই প্রতিভা বসুর জীবনের জলছবিতে। বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন, কিন্তু তাদেরও আর্থিক সামর্থ্য নিতান্ত সীমিত ছিল। তরুণ বয়সেই বিয়ে করে বুদ্ধদেব বসু সংসারী হয়েছিলেন, কন্যাপুত্র জন্মানোয় পরিবার বেড়েছে, পরিবার প্রতিপালনের জন্য উপার্জন করতে হয়েছে লিখে, যতদিন না জনপ্রিয় লেখিকা, পত্নী প্রতিভা বসু তাঁর উপার্জন নিয়ে পাশে এসে দাড়িয়েছেন। পারিবারিক প্রয়োজনে বেশকিছুদিন কলেজে পড়ানোর চাকরি করেছেন। কলেজের সেই চাকরি ছেড়েছেন বিতৃষ্ণায়, বদলির ভয়ে। সাংবাদিকতা ছেড়েছেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল সাংবাদিকতা সাহিত্যের শত্রু। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের হাতে গড়া বিভাগও একসময় ছেড়ে গেছেন। জীবিকার জন্য যা কিছু করেছেন, সবই করেছেন সংসার প্রতিপালনের জন্য, জীবনধারণের জন্য। সুতরাং সবমিলিয়ে বলা যায় বুদ্ধদেব বসুর সব গল্প উপন্যাসে নিজেরই যেন আত্মবিস্তার। তিনি যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন সবই যেন গল্প-উপন্যাসের পাতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন যুক্ত একটি গল্প হলো 'সাধু দাদু আর গাবু মামা'। উক্ত গল্পের সাধু দাদু প্রচণ্ড আদর্শবাদী লোক। তিনি বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীতে ভারত তথা বাংলার আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত

উদ্বিগ্ন। তিনি বাড়িতে দুধ চিনি আনেন না, কারণ তাঁর মতে ''শিশুরা দুধ পাচ্ছে না, আর আমরা বসে বসে দুধ খাবো। ছী ছি ছি! একথা মনে আনাও পাপ।''[৩০] তিনি ধুতির সঙ্গে কোঁচা ঝোলানোর সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ বাবুদের কোঁচায় যতখানি কাপড়ের অপব্যয় হয়, তা দিয়ে তিনি হিসাব করে দেখেছেন, ভারতের এক দশমাংশ লোকতে খাটো ধুতি পরানো যায়। গল্পটিতে খুব সুন্দরভাবে বাংলার অর্থনৈতিক সংকটের কথা বর্ণিত— ''এই তো অবস্থা। এখন আমরা যদি কম করে না খাই, তাহলে গরিবেরা খাবে কী? গরিবের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে আমরা গোগ্রাসে গিলেছি এতদিন— ফেলেছি, ছড়িয়েছি, নষ্ট করেছি, এক একটা বিয়েতে একটি ছোটো পরিবারের একমাসের খাবার নষ্ট হয়েছে।''[৩১] এরকম সাধু দাদুর বাড়িতে বরাদ্দ চিনি যখন নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই শেষ হল, বাড়িতে তখন পুরো হুলুস্থূল লেগে যায়, অবস্থা সামলাতে বাড়ির কাজের লোক বলে সে এবার বাড়ি থেকে আসার সময় কিছু চিনি আনতে পারবে, আর তাছাড়া শহরে চিনি তো জোগাড় করাও যায়। চিৎকার করে ওঠেন সাধু দাদু, প্রথমত : নিয়মমত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খাদ্য সরানো ঠিক নয়, ব্ল্যাক মার্কেট বা কালো বাজারকে 'নিজের একটু সুখের জন্য' কিছুতেই প্রশ্রয় দেবেন না তিনি।

গল্পের দ্বিতীয় পর্বটি আপাতত মজার হলেও আসলে তা সমকালীন বাঙালির এক প্রখর আত্মসমালোচনা। সাধু দাদুর ছেলে গাবু বাড়ির মধ্যেই খুলে বসেছে তার কালো বাজার। সে নিজের ভাগের তেল চিনির সমস্তটা বেশি দামে বিক্রি করে বাড়ির অন্যান্য সকল সদস্যদের মধ্যে। সেই টাকাই আবার ভাই-বোনদের মধ্যে সুদেও খাটায় সে। এইভাবেই সে ব্যাঙ্কে জমিয়ে ফেলেছে

হাজার দেড়েক টাকা। সে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবার স্বপ্ন নিয়ে চলে। এতো আদর্শবাদী বাবা যিনি বাড়িতে দুধ চিনি পর্যন্ত আনেন না এই ভেবে যে গরীবেরা ক্ষীধায় মরছে আর তিনি বসে দুধ খাবেন, আর তাঁরই ছেলে লোককে ঠকিয়ে বাড়িতেই কালো বাজার সাজিয়ে তুলেছে, আসলে এটাই হচ্ছে আমাদের সমাজের করুণ বাস্তব উদাহরণ। এই গল্পটিতে বুদ্ধদেব বসু নিজস্ব ভাবনারই উত্তোরণ ঘটিয়েছেন।

রাজনৈতিক বাতাবরণ নিয়ে বর্ণিত বুদ্ধদেব বসুর আরেকটি গল্প হলো 'শেষ গ্রীষ্ম'। এই গল্পটির রচনাকাল ১৯৪৬-এর কাছাকাছি। স্বাধীনতা আসন্ন, ভারত ছাড়বে বৃটিশ। ইংরেজ রাজকর্মচারী জর্জ ট্রেভিলিয়ন এর স্মৃতিচারণ দিয়ে শুরু হয় 'শেষ গ্রীষ্ম' গল্পটি। কালচেতনা ও সমাজচেতনার বিস্ময়কর পরিচয় রেখেছেন বুদ্ধদেব বসু। দু'শো বছরের সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেবার সময়ে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের জটিল পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে ভাবে— 'নরহত্যার নাম কখনো খুন, কখনো আত্মরক্ষা, কখনো বীরত্ব, কখনো দেশপ্রেম। ট্রেভিলিয়ন-এর ভাবনায় সমকালের নানা বিষয় যাওয়া-আসা করে। ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক বৈরিতার প্রসঙ্গ নিয়ে যখন সে ভাবছে তখন অতর্কিতে এক যুবক এসে নিজেকে সাহেবের অবৈধ সন্তান বলে পরিচয় দেয় ও প্রমাণপত্রও দেখায় সে বলে ''আমি হিন্দুও না, মুসলমানও না, আমি গুণ্ডা।''[৩৩] তারপর কিছু সময় ট্রেভিলিয়ন ও দেশি রমণীর গর্ভজাত তার সন্তান মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলে। দীর্ঘদিনের শাসক ও শোষক ইংরেজ যেন যাবার সময়ে তার নিঃস্ব করে ফেলা উপনিবেশের দিকে তাকায়। শোনে দরিদ্র, অর্ধ শিক্ষিত, মূল্যবোধহীন, আত্মমর্যাদাহীন জাতির ক্ষুব্ধ যন্ত্রণার চিৎকার। জর্জ হিলম্যান ট্রেভিলিয়ন এর শেষ ভাবনা— ''কে পড়ে আছে

ঐ মেঝেতে, দুঃস্বপ্নের মতো ঐ মূর্তিটা কার? সাম্রাজ্যের ধ্বংস শেষ, সভ্যতার ব্যাধিবীজ, মানুষের মৃত্যুবাণ? ...সে কি আমি? সে কি আমার সন্তান?"[৩৪] স্বীকার্য, বাগ বাহুল্য সংযত করলে গল্পটি আরো দৃঢ় ও লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠতে পারতো। সে দুর্বলতা মেনে নিয়েও বলা যায়— এই গল্পটিতে বুদ্ধদেব মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছেন শুধু নয়, বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গী গুণে এটি হয়ে উঠতে পেরেছে আজকের পৃথিবীর যে কোন দেশের গল্প— সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ, ক্ষয়, শোষণ-জর্জরিত বর্তমান যুগের প্রতিবিম্ব এই গল্পটি।

আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপী সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধ বিচ্যুতি, মানবিক সম্ভাবনায় অবিশ্বাস এবং পোড়াজমিতে 'ফাঁপা মানুষের' বিপন্ন অস্তিত্বের প্ররিবেশে বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর আবির্ভাব। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত জটিল আবর্তময় সংকটদীর্ণ সময়ের অন্তঃসারকে অন্তরে ধারণ করেই গড়ে উঠেছিল বুদ্ধদেব বসুর জীবনবোধ। বুদ্ধদেব বসু কৈশোর থেকেই এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবন পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। দুই মহাযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর যুগসংক্ষোভ ও বৈশ্বিক বিপন্নতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর জীবন। ফলে অনিবার্যভাবেই যুদ্ধপীড়িত অস্থির পৃথিবীর পরিবর্তমান মূল্যবোধে তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। বৈনাশিক যুগধর্মের প্রভাবে তরুণ বয়সেই বুদ্ধদেব বসু সনাতন মূল্যবোধে বিশ্বাস হারিয়েছেন। আর এই যুগ ধর্মের প্রভাব বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যে বর্ণিত। সমসাময়িক জীবন প্রবাহ ও সমাজ বাস্তবতা অবলম্বন করেই রচিত হয় সাহিত্যকর্ম; কিন্তু মহৎ সাহিত্য প্রতিভার জাদুস্পর্শে এই সমকালীনতাই উত্তীর্ণ হয় চিরকালীনতায়। বুদ্ধদেব বসু বিশ্বাস করেন— কাল থেকে কালান্তরে গিয়ে চিরন্তনতার মহিমাপ্রাপ্তিই যে কোনো মহৎ সাহিত্যকর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ।

তথ্যসূত্র

১। গুণ সুমন/ বাংলা কথাসাহিত্যের নানা ঘরানা/ দি. সী. বুক এজেন্সি/ ২০১৩/ পৃ-৩৪

২। 'মজুমদার সমরেশ গল্পকার বুদ্ধদেব বসু'/ বুদ্ধদেব বসু : বৈচিত্রের নানা মাত্রা/ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় রত্নাবলী/ ২০১০/ পৃ-৪১৭

৩। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'প্রশ্ন'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-৭২

৪। তদেব/ পৃ-৭৪

৫। তদেব/ পৃ-৭৪

৬। তদেব/ পৃ-৭৮

৭। তদেব/ পৃ-৭৮

৮। তদেব/ পৃ-৭৯

৯। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'দুই মা'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-৩৩৫

১০। তদেব/ পৃ-৩৩৫

১১। তদেব/ পৃ-৩৩৫

১২। তদেব/ পৃ-৩৪৩

১৩। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ মা-বোন-ভাই/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-২৮৮

১৪। তদেব/ পৃ-২৮৯

১৫। তদেব/ পৃ-২৯২

১৬। তদেব/ পৃ-২৯২

১৭। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'প্রথমা'/ ১৯৫০/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-৩৬২

১৮। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ রাধারানীর নিজের বাড়ি/ এবং মুশায়েরা/২০১০/ পৃ-১২৮

১৯। মজুমদার অভীক/ আমি আর মুখোমুখি আমি/ মেট্রোতে বুড়ি/ স্বাগত সংলাপ/ সুধাংশুশেখর দে/ দেজ পাবলিশিং/ ২০০৮/ পৃ-২৩৩

২০। তদেব/ পৃ-২৩৩

২১। তদেব/ পৃ-২৩৩

২২। তদেব/ পৃ-২৩৪

২৩। ঘোষ শঙ্খ : বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ/ স্বাগত সংলাপ/ সুধাংশুশেখর দে/ দেজ/ ২০০৮/ পৃ-৩৮

২৪। গঙ্গোপাধ্যায় শান্তনু বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্প : ১৯৬০-১৯৭২/ প্রেমপত্র/ বুদ্ধদেব বসু বৈচিত্র্যের নানা মাত্রা/ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়/ রত্নাবলী/ ২০১০/ পৃ-৪৪০

২৫। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ অপ্রকাশিত ১৯৪৫ 'অসমাপ্ত গল্প'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-২২৯

২৬। তদেব/ পৃ-২৪০

২৭। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ একটি জীবন/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-৩৭১

২৮। তদেব/ পৃ-৩৭৯

২৯। তদেব/ পৃ-৩৮০

৩০। শুভেন্দু দাস মুন্সী/ ছোটো বড়োর দ্বন্দ্ব : ছোটদের বুদ্ধদেব/ বসু বুদ্ধদেব/ বৈচিত্র্যের নানা মাত্রা/ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়/ রত্নাবলী/ ২০১০/ পৃ-৫১৪

৩১। তদেব/ পৃ-৫১৪

৩২। চক্রবর্তী সুমিতা-আত্মার নির্জন স্বাক্ষর/ বুদ্ধদেব বসু মননে ও অন্বেষণে/ তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)/ পুস্তক বিপণি/ পৃ-১৭৩

৩৩। তদেব/ পৃ-১৭৩

৩৪। তদেব/ পৃ-১৭৩